শিক্ষা হোক বাস্তব ও জীবনমুখী

প্রজ্ঞা দাস

প্রকাশিত: ২১:২৮, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

একটি জাতির উন্নতির মূল শক্তি হলো তার শিক্ষা ব্যবস্থা। তবে শিক্ষা শুধু পরীক্ষার নম্বর আর সার্টিফিকেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং একজন মানুষকে দক্ষ, আত্মনির্ভরশীল ও বাস্তব জীবনের জন্য প্রস্তুত করে তোলাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

UNIBOTS

Advertisement: 1:59

তবে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা এখনো বই-কেন্দ্রিক, মুখস্থবিদ্যার ওপর নির্ভরশীল, যা শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের চাহিদার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর পরিবর্তে কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞানে সীমাবদ্ধ রাখছে। ফলে বর্তমান সময়ে শিক্ষাব্যবস্থা ও বাস্তব জীবনের মধ্যে যে ফারাক তৈরি হয়েছে, তা আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের হার প্রায় ৪৭ শতাংশ। অন্যদিকে কারিগরি শিক্ষাগ্রহণকারীদের মধ্যে বেকারত্বের হার মাত্র ৫ শতাংশ। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের বড় অংশই চাকরির জন্য যোগ্য নয় বলে মনে করেন নিয়োগকর্তারা।

তা ছাড়া বিশ্ববাজারে দক্ষ কর্মীর চাহিদা থাকলেও আমাদের দেশের তরুণদের সেই দক্ষতা নেই। ফলে বেকারত্ব দিন দিন বেড়েই চলেছে। এর মূল কারণ হলো তাদের শিক্ষা চাকরি বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা তৈরি করতে পারছে না।

ILO (International Labour Organization) এর রিপোর্ট অনুযায়ী, জীবনমুখী শিক্ষাগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা কর্মক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ বেশি সফল হয়।

এ ছাড়া, WEF (World Economic Forum)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের ৫০ শতাংশ চাকরির জন্য নতুন ধরনের জীবনমুখী এবং কর্মমুখী দক্ষতার প্রয়োজন হবে, যা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে সমর্থন করে না।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব

শিক্ষার্থী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাগ্রহণ করে, তাদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা সাধারণ শিক্ষার্থীদের তুলনায় ৪০ শতাংশ বেশি। অর্থাৎ জীবনমুখী শিক্ষা শুধু ব্যক্তিগত উন্নয়ন নয়, জাতীয় অর্থনীতির জন্যও অত্যাবশ্যক। এটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীলতা, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং নেতৃত্বের গুণাবলি গড়ে তোলে।

এই দক্ষতাগুলো আজকের প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে এবং উন্নয়নের পথে অপরিহার্য। তাই বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাকে যুগোপযোগী এবং বাস্তবজীবন ভিত্তিক করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলিত কারিকুলামের সংস্কার প্রয়োজন।

শিক্ষাক্রমে ব্যবহারিক বিষয়, কারিগরি শিক্ষা, জীবন দক্ষতা এবং প্রযুক্তি জ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আমরা এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে আছি, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), রোবটিক্স, ব্লকচেইন, বিগ ডাটা ইত্যাদির গুরুত্ব বেড়েই চলেছে।

কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এখনো এ বিষয়গুলোর ওপর পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। McKinsey Global Institute-এর গবেষণা অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে ৮০০ মিলিয়ন মানুষ প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কারণে চাকরি হারাবে।

সংখ্যাটা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপটে খুবই ভয়ের। পাশাপাশি বাংলাদেশের আইসিটি বিভাগ জানিয়েছে, বহির্বিশ্ব ক্রমেই যেভাবে আইসিটিনির্ভর হচ্ছে, ২০৩০ সালের মধ্যে আইটি খাতে ২০ লাখ নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে।
কিন্তু হতাশার বিষয় দক্ষ জনশক্তির অভাবে এই সুযোগ কাজে লাগানো কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তাই প্রযুক্তি জ্ঞানকে কোর্স আকারে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য ৬-১২ মাসের বাধ্যতামূলক ইন্টার্নশিপ চালু করা উচিত।

পাশাপাশি স্কুল ও কলেজ পর্যায়েও বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষা চালু করা যায়। এতে ছোট থেকেই শিশুরা বাস্তব জ্ঞান আহরণ করতে পারবে এবং ভবিষ্যৎ একজন দক্ষ এবং যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে।

প্রতিটি জেলায় প্রযুক্তি ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। তরুণদের স্বনির্ভর করে তুলতে তথ্যপ্রযুক্তি, কারিগরি ও ডিজিটাল প্রযুক্তিতে দক্ষতার কোনো বিকল্প নেই। শুধু চাকরির পেছনে না ছুটে, শিক্ষার্থীদের উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ তৈরি করতে হবে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এমন হতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা চাকরির জন্য অপেক্ষা না করে, বরং চাকরির সুযোগ তৈরি করতে পারে। উন্নত বিশ্বে শিক্ষার্থীদের ব্যবসা পরিচালনার শিক্ষা দেওয়া হয় ছোটবেলা থেকেই। কিন্তু বাংলাদেশে তার উল্টো।

বেশিরভাগ শিক্ষার্থী ব্যবসা বা স্ব-কর্মসংস্থান সম্পর্কে তেমন ধারণা রাখে না। যার ফলে উচ্চশিক্ষিত শিক্ষার্থীদের ভেতরে বেকারত্ব বাড়ছে। পাশাপাশি দেশও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই দেশ ও দশের স্বার্থে, শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে ব্যবসা পরিচালনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং সমস্যার সমাধান করার দক্ষতা অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণামূলক কাজের সুযোগ বাড়ানো উচিত।

সৃজনশীল চিন্তাভাবনাকে উৎসাহিত করতে পাঠ্যক্রমে গবেষণা ও রিসার্চ পেপার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আজকের দিনে শুধু একাডেমিক ডিগ্রি থাকলেই চাকরি পাওয়া সম্ভব নয়। বরং চাকরির বাজারে সফট স্কিল, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, দলগত কাজের অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

তাই প্রাইমারি লেভেল থেকে শিক্ষার্থীদের এ সকল গুণাবলি শিক্ষাদান বাধ্যতামূলক করতে হবে। তা ছাড়া শিক্ষাদানের শিক্ষাগুরু মানে শিক্ষকদেরও দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ এখনো অনেক শিক্ষক পুরনো যুগের মুখস্থকেন্দ্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করেন।

এ ধ্যান-ধারণা থেকে তাদের বের করে আনতে হবে সেই লক্ষ্যে শিক্ষকদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মমুখী এবং জীবনমুখী শিক্ষায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। পাশাপাশি সবচেয়ে বড় বিষয় আমাদের দেশে কারিগরি এবং জীবনমুখী শিক্ষার অগ্রগতি সাধনে সামাজিক সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি।

কেননা এখনো প্রায় ৮০ শতাংশ শিক্ষার্থী ও অভিভাবক গৎবাঁধা মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় লিখে সার্টিফিকেট অর্জনকেই শিক্ষা মনে করেন। শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের মধ্যে জীবনমুখী শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের কর্মমুখী জীবনমুখী, গবেষণাধর্মী এবং প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে।

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য শুধু সার্টিফিকেট অর্জন নয়, বরং বাস্তব জীবনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া। আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে শিক্ষাকে কর্মমুখী, প্রযুক্তিনির্ভর ও উদ্ভাবনী হতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করতে পারলেই বাংলাদেশ আত্মনির্ভরশীল ও উন্নত দেশে পরিণত হবে।

তাই সময় এসেছে শিক্ষার পুরনো ধাঁচ ভেঙে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। কিন্তু সেই মেরুদণ্ডকে শক্তিশালী করতে হলে শিক্ষাকে হতে হবে বাস্তবমুখী, বৃত্তিমূলক ও প্রযুক্তিনির্ভর। যা একটি দক্ষ, সচেতন, দায়িত্বশীল এবং একেকটি জনশক্তি তে রূপান্তরিত প্রজন্ম গড়ে তুলবে, যারা দেশের অর্থনীতির হাল ধরে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের কাতারে নিয়ে যাবে।

শিক্ষার্থী, ইডেন মহিলা কলেজ